বিমলেন্দু বড়ুয়া অনূদিত

মালয়েশিয়ার সঙ্ঘনায়ক

ড. কে. শ্রী ধর্ম্মানন্দ রচিত

"HOW TO OVERCOME YOUR DIFFICULTIES"

কি ভাবে পরিত্রাণ পাবেন

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Mottrijagat Bhante

লেখক পরিচিতি

মালয়েশিয়ার নায়ক মহাথেরো

ডঃ কে, শ্রী, ধম্মানন্দ

জে এস এম, ডি. লিট্।

পরম শ্রদ্ধেয় মালয়েশিয়ার নায়ক মহাথেরোর জন্ম মার্চ ১৮/১৯১৯ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ শ্রীলংকার মাতারাস্থ কিরিন্ডী গ্রামের ধর্মপ্রাণ কে, জি, গামাগে পরিবারে। শ্রীলঙ্কার প্রথানুযায়ী নামের অগ্রভাগে গ্রামের নামের প্রথম অক্ষর যথা কিরিন্ডি গ্রামে জন্মেছে সে কারণে কে অক্ষরটি ব্যবহৃত। ইংরেজ প্রভাবিত অঞ্চল হওয়াতেই বোধ হয় তাঁর নাম রাখা হয় মার্টিন। তিনি পরিবারের ছয় সন্তান-সন্ততীর (৩ ভাই ও ৩ বোন) মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ। তাঁর জননী এবং স্থানীয় বিহারের অধ্যক্ষ তাঁরই আঙ্কেলের প্রভাবে বাল্যকালেই বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন। ১২ বছর বয়সে তিনি প্রব্রজ্যিত হলে নাম হয় ধম্মানন্দ। ২২ বছর বয়সে কোটাউইলা বিহারাধ্যক্ষ কে, রত্নপালার উপধ্যায়ে উপসম্পাদিত হন। এর পূর্বেই ১৯৩৫-১৯৩৮ এই তিন বছর তিনি শ্রী ধম্মারামা পিরিন্নে, রত্নামাল ও কলম্বোর বিদ্যাবর্ধন ইনষ্টিটিউটে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপরের ৭ বছর তিনি কেলেনিয়ার বিদ্যালঙ্কার পিরিবেনে সংস্কৃত, পালি ত্রিপিটক ও বৌদ্ধ দর্শন অধ্যয়ন করেন এবং দর্শন, পালি, সংস্কৃত ও সিংহলী ভাষায় স্নাতক হন এবং উপাধিতে ভূষিত হন। স্বদেশে জ্ঞানার্জন শেষে তিনি ১৯৪৫ খৃস্টাব্দে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দি, সংস্কৃত ও ভারতীয় দর্শনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী (এম.এ) লাভ করেন। উল্লেখ্য- পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের প্রয়াত অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয়

সোসাইটি পুস্তিকা-১২

মালয়েশিয়ার সঙ্ঘনায়ক ড. কে. শ্রী ধম্মানন্দ রচিত
"How to overcome your difficulties"

কি ভাবে পরিত্রাণ পাবেন

বিমলেন্দু বড়ুয়া
অনূদিত

পালি বুক সোসাইটি বাংলাদেশ
নালন্দা, ১৫৬, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রকাশক ঃ পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘী পূর্ণিমা তিথি,
৬ই ফাল্গুন, ১৩৮৭ (১৯৮০)

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি, ১৪০৬ (১৯৯৯)

প্রাপ্তিস্থান ঃ নালন্দা, ১৫৬, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মুদ্রণে ঃ প্রান্তি কম্পিউটার
১৮০, আমিন শপিং সেন্টার (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

বিনিময় ঃ পাঁচ টাকা

উৎসর্গ

স্বাধীন স্বদেশ প্রতিষ্ঠায়
যে মহৎপ্রাণ নিজেকে
উৎসর্গ করেছিলেন সেই
শ্রদ্ধেয় জেঠুমনি
শহীদ ভবেশ চন্দ্র বড়ুয়া'র
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি
উৎসর্গ করা হলো।

গ্রাম ঃ সাধক নগর
থানা ঃ ফটিকছড়ি
জেলা ঃ চট্টগ্রাম।

তুষার কান্তি বড়ুয়া
সদরঘাট, চট্টগ্রাম।

শহীদ ভবেশ চন্দ্র বড়ুয়া

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

যাঁদের শোণিত ধারায় প্লাবিত হয়ে আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়, তাঁদের তালিকায় স্বর্ণাক্ষরে জ্বল জ্বল করছে একটি নাম "শহীদ ভবেশ চন্দ্র বড়ুয়া"। চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধ পল্লী সাধকনগর (জানারখিল) গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বাবু বিপিন চন্দ্র বড়ুয়ার ঔরসে শ্রীমতী বরদা সুন্দরী বড়ুয়ার গর্ভে ১৯২৮ সালে তাঁর জন্ম। পিতা-মাতার আট সন্তানের মধ্যে তিনি ৬ষ্ঠ। ছেলেবেলা থেকেই এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি নিজেকে গড়ে তোলেন। শিক্ষা জীবন শেষে Pakistan Air Force এ Wirless Observer হিসেবে যোগদান করেন ১৯৫১ সালের জানুয়ারীতে। East Pakistan Air Force এর Football Team এর তুখোর খেলোয়াড় হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। খেলতে গিয়ে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে ১৯৫৮ সালে PAF থেকে অব্যাহতি নেন এবং পূর্ব পাকিস্তান ডাক বিভাগে যোগ দেন। পরবর্তীতে ১৯৬৩ সালে চিটাগাং পোর্ট ট্রাষ্ট এর Substitute Junior Clerk হিসেবে যোগদান করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বন্দরের কর্মচারীদের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার এবং মুক্তিসংগ্রামের সহযোগিতামূলক কর্মকান্ডে জড়িত থাকার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ১৯৭১ সালের ২৭শে এপ্রিল চট্টগ্রাম বন্দর থেকে কুখ্যাত হানাদার বাহিনী কর্তৃক তিনি ধৃত হন। সেই থেকে তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে। খবর পাওয়া যায় তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। কিন্তু যার ঠাঁই মানুষের বুকের গভীরে, তাঁর মৃত্যু কিভাবে সম্ভব? তাঁর স্মৃতি চির অম্লান। আমরা তাঁর পারলৌকিক সুস্থিতি কামনা করি। তাঁর স্বপ্নে দেখা সোনার বাংলার সমৃদ্ধি কামনা করি।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

প্রাসঙ্গিক

আজ হতে উনিশ বছর পূর্বে প্রকাশিত মালয়েশিয়ার সঙ্ঘনায়ক ড. কে. শ্রী ধর্মানন্দ মহাথেরো রচিত "How to overcome your difficulties" পুস্তিকাটির ভাবানুবাদ "কিভাবে পরিত্রাণ পাবেন" নিঃশেষ হয়েছে বহুদিন পূর্বে।

মূল্যবান পুস্তিকাটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ইচ্ছা বহুদিনের। আমাদের ইচ্ছা পূরণে এগিয়ে আসেন তরুণ সমাজসেবী বাংলাদেশ বৌদ্ধ যুব পরিষদ চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের প্রভাষক তুষার কান্তি বড়ুয়া। তিনি তাঁর জেঠামহাশয় শহীদ ভবেশ চন্দ্র বড়ুয়ার পুণ্যস্মৃতি এবং মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি চির জাগ্রত রাখার মানসে প্রকাশনার ব্যয়ভার গ্রহণ করে আমাদের ঋণী করেছেন। এ ঋণ তখনই লাঘব হবে যদি পুস্তিকাটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হৃদয়ঙ্গম করে পাঠককুল সুশীল সমাজ গড়ার কাজে লিপ্ত হন।

জয়তু মুক্তি সংগ্রামী,
বাংলাদেশ চিরস্থিতি হোক।

রণজয় বড়ুয়া
সম্পাদক
প্রচার ও প্রকাশনা পর্ষদ
পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ।

শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা,
১৪০৬ বঙ্গাব্দ-১৯৯৯ খৃঃ

সবিনয় নিবেদন

পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে তারই প্রধান কান্ডারী, বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীবিজয় কৃষ্ণ বড়ুয়া একদিন আমার অফিসে এসে অন্যান্য কয়েকটি বই সহ একটি ইংরেজী বই আমার হাতে দিয়ে বললেনঃ বইটি পড়ে দেখুন, ভাল লাগলে অনুবাদ করবেন, অনেক উপকার হবে।

বইটি পড়ে শুধু ভাল লাগা নয়, বিমুগ্ধ হয়ে গেলাম। মালয়েশিয়ার 'বুডিস্ট মিশনারী সোসাইটি'র প্রকাশিত খ্যাতনামা বৌদ্ধ মনীষী, সুপন্ডিত ড. কে. শ্রী ধর্ম্মানন্দ মহানায়ক থেরো রচিত "How to overcome your difficulties" নামে এই বইটি পরিসরে ক্ষুদ্র হলেও, ভাবের দিক দিয়ে অত্যন্ত বিশাল, মহৎ। এ ধরনের বই অনুবাদ করা বাস্তবিক দুরূহ ব্যাপার এবং এটা আমার প্রথম প্রয়াসও বটে। অবশ্য পেশাগত দিক দিয়ে দেশ-দুনিয়ার কতো খবরই তো নিত্যদিন আমি অনুবাদ করে চলেছি। তবু ভড়কে গেলাম। কিন্তু বন্ধুবর বিজয়বাবু প্রায় এসে খোঁজ নেন, তাগাদা দেন। অবশেষে রাতের শিফ্‌টের কাজ শেষে অফিসে বসে আন্তরিক নিষ্ঠা নিয়ে একটু একটু করে এই মূল্যবান বইটির বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন করলাম।

অনুবাদ কাজে এক সময় প্রয়াত কবিবন্ধু সুসাহিত্যিক অশোক বড়ুয়ার কাছ থেকে যে অকুণ্ঠ প্রেরণা পেয়েছিলাম, তা আজ যথেষ্ট কাজে লেগেছে। তাই বইটির প্রকাশ কালে প্রয়াত অশোক বড়ুয়ার পুণ্যস্মৃতি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি। অনুবাদের পান্ডুলিপি আমার সহকর্মী সুহৃদ শ্রীঅরুণ দাশগুপ্ত এবং প্রীতিভাজন গুণগ্রাহী শ্রীধনীরাম বড়ুয়া অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে আদ্যোপান্ত পাঠ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন। এজন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। আর পরহিতব্রতী, পুস্তকপ্রাণ প্রিয়বর বিজয় বাবুর অশেষ উৎসাহ-অনুপ্রেরণাই এই অনুবাদ প্রকাশের মূল উৎসাহ। তাই সমস্ত কৃতিত্ব ও প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আমিই দায়ী। তবু বইটি হাজারো দুঃখ-কষ্ট আর সমস্যা প্রপীড়িত মানুষের মনে খানিকটা শান্তি আর স্বস্তি দেবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় আর প্রত্যাশা পোষণ করি।

বিমলেন্দু বড়ুয়া
২৫শে আগস্ট, ১৯৮০।

কি ভাবে পরিত্রাণ পাবেন

উদ্বেগ এবং ভীতি

আপনি কি উদ্বিগ্ন? আপনি কি দুর্দশাগ্রস্ত? যদি তা-ই হয় আপনাকে এই পুস্তিকাটি অনুধাবনের সুপারিশ করছি। এই পুস্তিকার কর্মবাণী আপনার প্রতি এবং যারা অযথা উদ্বেগাকুল, এমনকি, মৃত্যুভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত তাদের প্রতি উৎসর্গ করা হল।

দুশ্চিন্তা আর দুঃখ যেন যমজ অকল্যাণ। পরস্পর তারা এক সাথে হাতধরাধরি করে চলে। এ বিশ্বে তাদের সহ-অবস্থান অশুভভাবে। আপনি যদি দুশ্চিন্তা কিংবা উদ্বেগ বোধ করেন তাহলে আপনি হবেন দুঃখভারাক্রান্ত। দুঃখ ভারাক্রান্ত হলেই তো আপনি উদ্বিগ্ন হলেন। আমাদের অবশ্যই বাস্তবকে মোকাবেলা করতে হবে। বাস্তবতা থেকে আমরা যেমন পালাতে পারি না, তেমনি দুঃখ-দুশ্চিন্তার এই যমজ অকল্যাণকেও আমাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে দিতে পারি না। এই অশুভ শক্তিকে আমাদের অবশ্যই জয় করতে হবে। এটা আমরা করতে পারি একমাত্র দৃঢ় সংকল্প আর ধৈর্যের দ্বারা সঠিকভাবে পরিচালিত আমাদের নিজস্ব মানবিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে। যথাযথ সমঝোতা ও সতর্কভাবে প্রয়োগকৃত বুদ্ধিমত্তার সাহায্যেই আমরা আমাদের ভাবাবেগ দমন করতে এবং সকল দুঃখ-দুশ্চিন্তার অবসান ঘটাতে সক্ষম হতে পারি।

আমাদের দুশ্চিন্তা আমরা নিজেই সৃষ্টি করে থাকি। এই দুঃখ-দুশ্চিন্তা আমাদের মানস-সঞ্জাত। আমাদের অহমিকা ও স্বার্থবাদী মনোভাব এবং কোন বিষয়বস্তুর ব্যাপারে আমাদের স্ফীত ও মিথ্যা মূল্যবোধ সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি ও ধারণা করার অক্ষমতা কিংবা ব্যর্থতার মাধ্যমেই আমরা নিরন্তর দুঃখ-দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করছি। বিশ্বের কোন কিছুই অবিনশ্বর নয়, এই উপযুক্ত প্রেক্ষিতে যদি সকল বস্তুকে আমরা দেখতে পারি এবং আমাদের অহংবাদী স্বকীয় সত্ত্বা যে অপরিশীলিত মনের দুরন্ত দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ কল্পনারই ফলশ্রুতি, এই উপলব্ধি যদি আসে– তাহলেই আমরা আমাদের দুঃখ-দুশ্চিন্তার বিলোপ সাধনের উপায় উদ্ভাবনে অগ্রসর হতে সক্ষম হবো। আত্মচেতনা বিস্মৃত হয়ে

মানবতার সেবায় ও কর্মে নিয়োজিত হবার জন্য আমাদের অবশ্যই মন আর হৃদয়ের সংস্কার সাধন করতে হবে। এটাও একটি উপায় যার মাধ্যমে আমরা প্রকৃত শান্তি আর সুখ পেতে পারি।

বহু লোকের এমন কিছু বাসনা-কামনা, লোভ-লালসা, ভয়-উদ্বেগ আছে যেগুলিকে তারা প্রয়োজনীয় খাতে নিয়ে যেতে জানে না এবং এসবের অস্তিত্ব স্বীকার করতেও তারা লজ্জা পায়। কিন্তু এসব ক্ষতিকর আবেগেরও শক্তি আছে। এসব ক্ষতিকর আবেগ কিভাবে দমন করতে হয় এবং কিভাবে তা থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব, সেটা যদি জানা না থাকে তাহলে শরীরে কঠিন ব্যাধি দেখা দেবে। এসব ক্ষতিকর আবেগ-অনুভূতির অবসান, সঠিক ধ্যান-ভাবনা পদ্ধতি কিংবা মানসিক উৎকর্ষণের মাধ্যমেই করা যেতে পারে। কেননা, অপরিশীলিত মনই এধরনের উদ্বেগ-দুশ্চিন্তার প্রধান কারণ।

যখন আপনার মনে কোন উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা দেখা দেয় তখন আপনার মুখমন্ডল নিশ্চয়ই অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। সেই সময়ে আপনার সাথে যাদের সাক্ষাৎ ঘটে তাদের সবার কাছে কিন্তু নিজের অপ্রসন্ন মুখ প্রদর্শন করবেন না। যারা আপনার প্রকৃত সাহায্য করতে পারবে একমাত্র তাদের কাছেই আপনার দুঃখ-দুশ্চিন্তার কথা ব্যক্ত করতে পারেন। সকল প্রকার দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অসুবিধা মোকাবেলা করেও আপনি যদি আপনার মুখে হাসি বজায় রাখতে পারেন, তাহলে কী সুন্দরই না দেখাবে তাতে। আপনি যদি সত্যি চেষ্টা করেন তাহলে এটা খুব বেশি কষ্টসাধ্য নয়। অনেক তরুণ-তরুণী তাদের প্রণয় বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেলে দুশ্চিন্তায় অত্যধিক মুষড়ে পড়ে। এমনকি হতাশা ও ব্যর্থতায় বিড়ম্বিত হয়ে তারা প্রায় সময় আত্মহত্যা করতে পর্যন্ত মনস্থির করে ফেলে। তাদের কারো কারো স্থান হয় পাগলা গারদে। এ ধরনের ভগ্ন-হৃদয়ের অনেক যুবক-যুবতী দুর্গত জীবন যাপন করে। জীবনের প্রকৃত স্বভাব সম্পর্কে সম্যক ধারণার অভাবেই এসব অশুভ ঘটনা ঘটে থাকে। যেমন করে হোক এ বিশ্বে বিদায় কিংবা বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। এটা জীবনের প্রারম্ভেও ঘটতে পারে; কখনো মধ্যবয়সে আর কখনো বা শেষদিকে, তবে এটা নিশ্চিতভাবে অনিবার্য। এ ধরনের ব্যাপার যখন ঘটে তখন তার কারণ কোথায় নিহিত তা অবশ্যই খুঁজে দেখার চেষ্টা চালাতে হবে। তবে, বিচ্ছেদ যদি একেবারে নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত হয় তাহলে জীবনের

স্বভাব-প্রকৃতি অনুধাবন করে সেটাকে সহ্য করার সাহস অবশ্যই অর্জন করতে হবে। অপরপক্ষে, কিন্তু কেউ যদি সত্যিই সেই শূণ্যতা পূরণে আগ্রহী থাকে, তাহলে নতুন বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে নিতে তার পক্ষে তেমন অসুবিধা হয় না।

তথাগত বুদ্ধ বলেছেন, "যে কোন স্থানেই হোক না কেন, ভয়ের উদয় ঘটে নির্বোধের মধ্যে, জ্ঞানীর মধ্যে নয়।" ভয় ভীতি মনের একপ্রকার অবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। মনের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশ সাপেক্ষ; মনের ভাবনা নেতিবাচক হলে ভয়-ভীতি দেখা দেয়; চিন্তা-ভাবনাকে গঠনাত্মক কাজে লাগালে তাতে আশা উদ্দীপনা অনুভূত হয়। সুতরাং মনের চিন্তা-ভাবনা ব্যবহারের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদের ওপরই নির্ভর করে। প্রত্যেক মানুষেরই নিজের মনকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রয়েছে। প্রকৃতি মানুষকে একটি জিনিস ছাড়া সবকিছু সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিয়েছে। আর সেটি হচ্ছে চিন্তা-ভাবনা। বস্তুতঃ মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করছে তার সূচনা কিন্তু চিন্তাধারার মাধ্যমেই প্রথম ঘটে থাকে। এই চিন্তাধারা মানুষকে এমন এক আদর্শের পর্যায়ে নিয়ে যায় যার মাধ্যমে ভয়ভীতি জয় করা সম্ভবপর।

একদিন জনৈক খ্যাতনামা ব্রিটিশ শবব্যবচ্ছেদ বিশারদকে তাঁর এক ছাত্র জিজ্ঞেস করলো ঃ "ভয় উপশমের সর্বোত্তম উপায় কি, স্যার?"

তদুত্তরে তিনি বললেন ঃ "কারো জন্য কোন কিছু করার চেষ্টা।"

এই উত্তর পেয়ে ছাত্রটি সাতিশয় বিস্মিত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার জন্য জানালে শিক্ষকটি বললেন ঃ তুমি একই সময়ে একসাথে তোমার মনে দু'টি পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারা রাখতে পারবে না। এক চিন্তাধারা অপর চিন্তাধারাকে সবসময় বিতাড়িত করবেই। যেমন দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যদি তোমার মন কাউকে সাহায্য করার জন্য নিঃস্বার্থ অভিলাষে সম্পূর্ণ বিভোর থাকে সেই সময়ে কোন ভয়ভীতি সেখানে কিছুতেই বাসা বাঁধতে পারবে না।

"উদ্বেগ কেবল আয়ু নয়, রক্তও শুষে নেয়।" মৃদু ভয়-ভীতি, উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা আত্মরক্ষারই স্বাভাবিক সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু সার্বক্ষণিক ভয় আর দীর্ঘকালীন উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা মানবদেহের চরম ক্ষতিকর শত্রু। এগুলি স্বাভাবিক

দৈহিক ক্রিয়াকলাপ বিপর্যস্ত করে দেয়।

অন্যকে কিভাবে খুশি করতে হয় তা যদি আপনার জানা থাকে, তাহলে আপনি সবসময় প্রফুল্লচিত্তেই থাকবেন। কারণ, আপনার মনে তখন কোনরূপ উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারবে না।

প্রকৃতির বাণী

বস্তুগত লাভ-সৎকারের স্বার্থে আধুনিক মানুষ প্রকৃতির বাণী মনোযোগ দিয়ে শোনে না। তার মানসিক তৎপরতা ভবিষ্যৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় এমনভাবে আচ্ছন্ন থাকে যে, সে তার দৈহিক চাহিদা পর্যন্ত উপেক্ষা করে চলে এবং বর্তমানের মূল্যবান সময়টুকু পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যায়। বর্তমান মানব সমাজের এই অস্বাভাবিক ব্যবহার আচরণ বিশ্ব-ব্যবস্থা তথা মানবজীবন ও তার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণারই তাৎক্ষণিক ফলশ্রুতি। এটাই সর্বপ্রকার হতাশা, উদ্বেগ, ভয় এবং আমাদের যুগের নিরাপত্তাহীনতার প্রধান কারণ। যিনি প্রকৃতই শান্তিলাভের জন্য আগ্রহী তাঁর পক্ষে অন্যের স্বাধীনতায় ব্যাঘাত করা অনুচিত। অন্যকে বিব্রত ও প্রতারণা করে সুখের সন্ধান করা ঠিক নয়, এটা একটি ভ্রান্ত পদ্ধতি।

"আপনি কিছু লোককে সবসময় এবং সব লোককে কোন কোন সময় প্রতারণা করতে পারেন, কিন্তু সব লোককে সবসময় প্রতারণা করতে পারবেন না।" (আব্রাহাম লিঙ্কন)।

যদি মানুষ নিষ্ঠুর ও ধূর্ত হয়, প্রকৃতির নিয়ম নীতি ও বিশ্ববিধানের বিরুদ্ধেই সবসময় জীবনযাপন করে তাহলে তার কদর্য কার্যকলাপ, কথা-বার্তা আর চিন্তা ভাবনায় সমগ্র পরিবেশই দূষিত হয়ে ওঠে। এ ধরনের অপকর্ম আর কলুষিত চিন্তা-ভাবনার ফলে মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের উৎপাদন ব্যাহত হয়ে পড়ে, প্রকৃতি হারিয়ে ফেলে তার প্রজনন ক্ষমতা। দেখা দেয় মহামারী আর বিভিন্ন বিপর্যয়।

অপরদিকে মানুষ যদি প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতি অনুসারে জীবন যাপন করে, ন্যায়সঙ্গত পথে পরিচালিত হয় তাহলে তার পুণ্যকর্মের প্রভাবে পরিবেশ পুত-পবিত্র হয়ে ওঠে। অন্যান্য প্রাণীর প্রতি মৈত্রী-করুণা প্রদর্শনের

মাধ্যমেও মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির উপযোগী করে পরিবেশের পরিবর্তন করা যেতে পারে।

আপনি হতে পারেন একজন অত্যন্ত আধুনিক কর্মব্যস্ত মানুষ। কিন্তু প্রত্যহ কয়েকটি মূল্যবান বইপত্র পাঠে কয়েক মিনিট ব্যয় করতে ভুলবেন না। এই অভ্যাস আপনাকে যথেষ্ট স্বস্তি দেবে, আর দুশ্চিন্তা-উদ্বেগ বিস্মরণেও আপনার মনোবল বিকাশে সক্ষম করবে। একই সাথে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আপনার একটি ধর্মও রয়েছে। ধর্ম আপনার নিজের কল্যাণের জন্য। কাজেই ধর্ম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা এবং প্রত্যহ ধর্মীয় কাজ কর্ম সম্পাদনে কয়েক মিনিট অতিবাহিত করা আপনার একান্ত কর্তব্য।

মানসিক স্বাস্থ্য ও অপরাধ প্রবণতা

স্বাস্থ্যের ব্যাপারে, আমাদের যুগে শুধু যক্ষ্মা কিংবা ক্যান্সারই সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাধি নয়। কারণ, যক্ষ্মা এখন প্রায় নিয়ন্ত্রণাধীন আর ক্যান্সার নিরাময়ও অদূর ভবিষ্যতে সম্ভবপর হবে বলে আশা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, যেসব ব্যাধি সর্বত্র ছড়িয়ে আছে কিংবা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেগুলির মধ্যে মানসিক ব্যাধি ও গোলযোগই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ও আংশকাজনক। মানসিক রোগী ও বিভিন্ন ধরনের স্নায়বিক ব্যাধিগ্রস্তদের জন্য আমরা হাসপাতালের পর হাসপাতাল আর নিরাময় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে বাধ্য হচ্ছি। কিন্তু তাতেও চিকিৎসার কি শেষ আছে? এমন অসংখ্য অনেক ব্যাধিগ্রস্ত লোক রয়েছে যাদের চিকিৎসা একান্ত প্রয়োজন, অথচ তারা কোন চিকিৎসা পাচ্ছে না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আমাদের সমাজের মধ্যে অপরাধী ব্যক্তি আর মানসিক ব্যাধিগ্রস্তকে একই কাতারে উল্লেখ করা হল কেন? মহামতি ফ্রয়েডের গবেষণা থেকে যে সুষ্ঠু ও সুদূরপ্রসারী ফলাফল পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায়, অপরাধী আর কর্তব্যবিমুখ ব্যক্তিরাই মানসিকভাবে ব্যাধিগ্রস্ত। তাদের শাস্তির চেয়ে চিকিৎসাই অধিকতর প্রয়োজন। সকল 'প্রগতিবাদী' সামাজিক সংস্কারের ভিত্তিতে যে সমস্যা নিহিত, সে সম্পর্কে এটাই হচ্ছে উদার দৃষ্টিভঙ্গী। প্রতিশোধের চেয়ে সংশোধনের জন্য এটাই হচ্ছে প্রশস্ত পথ।

আপনার প্রতিবেশীকে জানুন

অন্য লোকেরা কিভাবে আছে তা আমরা কখনো দেখি না। আমরা আমাদের স্বকীয় সমাজের বিভিন্নস্তরের লোকদের জীবন সম্পর্কেও কিছু জানতে চাই না। আমরা যদি স্বাস্থ্যবান হই তাহলে পীড়িত কি প্রকার তা জানতে পারি না এবং যদি আমরা পঙ্গু হই তাহলে শক্তিমানের ক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারি না।

এ ধরনের অভিজ্ঞতার অভাবই সৃষ্টি করে অসহিষ্ণুতা। কারণ, সহিষ্ণুতা কেবল সমঝোতার ফলেই গড়ে ওঠে এবং অভিজ্ঞতা ছাড়া সমঝোতা আসতে পারে না। সুতরাং জীবনের সকল দিক সম্পর্কে যথাসম্ভব ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করা আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। এ ব্যাপারে দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ করা উত্তম। তবে বিলাস ভ্রমণ নয়।

মানুষের দুঃখ

বুদ্ধের শিক্ষা হল ঃ সকল মানুষের দুঃখের উৎপত্তি হচ্ছে ভুল জিনিস চাওয়া থেকে, অর্থ দিয়ে কেনা যায় এমন আনন্দ থেকে, অপরের ওপর ক্ষমতার প্রয়োগ থেকে এবং সর্বোপরি মৃত্যুর পরেও বাঁচতে চাওয়া থেকে। এসব বিষয়ের অভিলাষ মানুষকে ভয়ংকর স্বার্থপর করে তোলে। এসব অভিলাষ সৃষ্টি হয় কেবল আত্মসর্বস্বতার জন্য। ঐ অবস্থায় অন্যের কি ঘটছে না ঘটছে তা চিন্তা করার অবকাশ কখনো থাকেনা। আসক্তিপরায়ন লোকদের সকল ইচ্ছা-অভিলাষ, কামনা-বাসনা যেহেতু পূরণ হয় না, সেহেতু তারা অস্থির ও অসন্তুষ্ট। এই অস্থিরতা পরিহারের একমাত্র উপায় হচ্ছে কামনা-বাসনা বর্জন করা। কিন্তু সেটা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। তবে কোন মানুষ যদি তা অর্জন করতে সক্ষম হন তাহলে তাঁর জীবনে আসে পূর্ণতা ও প্রশান্তির স্নিগ্ধ পরিবেশ।

আমরা আনন্দ উপভোগ করি না, আনন্দের দ্বারা আমরা পর্যুদস্ত হই (অর্থাৎ যেসব আনন্দ আমাদের সব শক্তি নিঃসাড় করে ফেলে, আমরা সেই আনন্দ লাভের জন্যই অসীম উৎকণ্ঠায় নিপীড়িত হই)। এই প্রপঞ্চময় জগতে আনন্দ সন্ধানে আমরা উপভোগের চেয়ে দুর্ভোগই অধিকতর ভোগ করে থাকি।

কালই বেদনার উপশম ঘটাবে

দুঃখ-কষ্ট অতিক্রান্ত হয়ে যায়। আজ আপনি যে কারণে কেঁদেছেন তা শীঘ্রই বিস্মৃতির অতলে মিলিয়ে যাবে। আপনি কেঁদেছিলেন এটা হয়তো মনে পড়তে পারে, কিন্তু কি জন্য কেঁদেছিলেন তা মনে না আসারই সম্ভাবনা বেশি।

বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের জীবন সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা বেড়ে যায়। দিনের বেলায় আমাদের চিত্ত চাঞ্চল্যকর অথবা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কোন ঘটনা ঘটে থাকলে কিংবা কারো বিরুদ্ধে মনে কোনরূপ বিক্ষোভ দেখা দিলে এবং যে ব্যক্তি আমাদের ক্ষতি করেছে তার ওপর প্রতিশোধ কিভাবে নেয়া যায় তা চিন্তা করলে, আমাদরে মন-মেজাজ, হাব-ভাব, চেহারা কি রকম হয়ে পড়ে তা যদি রাতে শুয়ে শুয়ে নিঝুমভাবে ভাবি তাহলে আমরা নিজেরাই বিস্মিত হয়ে যাবো। আমরা কোন কিছুর ব্যাপারে ক্রোধান্বিত হতে পারি, কিন্তু পরে যদি চিন্তা করে দেখি যে কেন, কিজন্য এত ক্রোধ, তাহলে অনুশোচনা আসবেই। এবং এভাবে বিস্ময় আর অনুতাপ এলে আমরা নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারব যে শক্তি আর সময়ের কতই না অপচয় ঘটছে এবং আমরা অবলীলাক্রমে কত দুঃখ-দুর্দশারই না শিকারে পরিণত হয়েছি।

আমাদের দুঃখ-কষ্ট যা-ই হোক, যতই ভয়ংকরভাবে তা আসুক না কেন, তার আঘাতের বেদনা-ক্ষত সময়ে শুকিয়ে যাবে। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, আমরা প্রথমেই আঘাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য কিছু করতে পারি। আমাদের শক্তিকে শুষে নিতে এবং আমাদের অসুখী করতে কোন লোককে এবং দুঃখ-কষ্টকে সুযোগ দেবো কেন? সেই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে ঃ অন্য কোন লোক নয় আমরা নিজেরাই আমাদের দুঃখকষ্টের জন্য দায়ী, আমরাই আমাদের অসুখী করে তুলি।

আপনার অফিসে কিংবা আপনি যেখানে কাজ করেন সেখানে কিছু অসুবিধা বা গোলমাল হয়তো রয়েছে কিন্তু তা আপনার ঘরে টেনে এনে পারিবারিক পরিবেশকে অশান্ত করে তোলা উচিত নয়।

আপনার অনুধাবন করা উচিত যে, এসব সমস্যা ও দুঃখকষ্টের

উপশম কিংবা সমাধান আছে এবং তা আমাদের আত্মসর্বস্ব কামনা-বাসনা এবং সকল প্রকার বিভ্রান্তি ও অবিদ্যার অবসান ঘটিয়েই উদ্ভাবন করতে হয়।

আমরা যখন কোন সমস্যার সমাধান বের করতে ব্যর্থ হই, তখন উদোরপিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর জন্য তৎপর হয়ে উঠি, তখন এমন কোন ব্যক্তির খোঁজ করি যার বিরুদ্ধে আমাদের সকল অভিযোগ খাড়া করতে পারি। বস্তুতঃ এ ধরনের কাজ করে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ মজা পায়। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভ্রান্ত মনোভাব। অন্যের প্রতি ক্ষোভ কিংবা ক্রোধ প্রদর্শন করা আমাদের উচিত নয়। আমাদের নিজস্ব সমস্যাদি সমাধানকল্পে আমাদেরকে একান্ত ধৈর্য ও কষ্ট সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে শান্তভাবে কাজ করে যেতে হবে। যেকোন অসুবিধা কিংবা দুঃখকষ্ট মোকাবেলা করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে।

সুখ ও বিষয়াসক্তি

অনেকেই মনে করে যে, তারা অর্থ পেলে তাদের সব সমস্যার সমাধান করতে পারবে। কিন্তু তারা এটা বুঝতে পারে না যে অর্থ নিজেই নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। শুধু অর্থ দিয়ে সব সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে না।

অনেক লোক কখনো এটা চিন্তা করে না। তারা সারা জীবন বিষয়-আশয় সঞ্চয়ের জন্য নিজের সর্বশক্তি ব্যয় করে থাকে। তারা যত পায়, তত চায়, কিছুতেই তারা সন্তুষ্ট হয় না। কাজেই তারা কখনো সুখী কিংবা তৃপ্ত হতে পারে না।

যখন আমরা কোন কিছু হারিয়ে বিয়োগ-ব্যথায় মুহ্যমান হয়ে পড়ি তখন যদি নিম্নলিখিত উপদেশবাণী স্মরণ করি তাহলে তা আমাদের মনে বিপুল সান্ত্বনা দেবে ঃ

"বলোনা, এটা তোমার, ওটা আমার
কোনোদিন কেনোকালে
শুধু বলে যেও, এসেছিল এটা তোমার সকাশে
আর ওটা এসেছিল আমারই পাশে,

দুঃখ করা সাজে না কখনো ম্রিয়মান
ক্ষীয়মান এতটুকু আলো নিয়ে
জেনে রাখা ভালো, গৌরবজনক সকল কিছু
নিঃশেষে যাবে মিলিয়ে।"

ধন-সম্পদ আপনার জন্য এমন কোন জিনিস নয় যে যা আপনি চাইলেই পাবেন কিংবা পেলেও যেখানে-সেখানে জড়ো করে রাখবেন। সম্পদ আপনার কল্যাণে এবং অন্যের কল্যাণে ব্যবহারের জন্যই। দেশের প্রতি, জনগণের প্রতি ও ধর্মের প্রতি আপনার যেসব দায়-দায়িত্ব রয়েছে, তা পূরণ না করে কেবল আপনি যদি আপনার ধনসম্পদ আহরণের লিপ্সায় সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকেন, তাহলে এ পৃথিবী ছেড়ে যাবার কালেও উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাবেন না। যে ধনসম্পদ আপনি এত দুঃখকষ্টে উপার্জন করেছেন তা দিয়ে আপনি উপকৃত হবেন না।

জুয়ার মাধ্যমে ধনসম্পদ উপার্জনের আশা করা অনেকটা মেঘের মাধ্যমে রোদ থেকে রক্ষার আশ্রয় গড়ে তোলার আকাঙ্খার মতো। অথচ কাজে নিষ্ঠার মাধ্যমে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির আশা করা রোদ-বৃষ্টি সবকিছু থেকে রক্ষার আশ্রয় হিসেবে একটি স্থায়ী গৃহ নির্মাণের মতো।

"আপনার ধন-সম্পদ আপনি মরে গেলেও থাকবে। আপনার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন শ্মশান বা কবর পর্যন্ত আপনাকে অনুসরণ করবে। কিন্তু জীবিতকালে আপনি ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য যা কিছু করেছেন কেবল তা-ই শ্মশান-কবর ছাড়িয়ে আপনাকে অনুসরণ করবে।"

এমন অনেক জিনিস আছে যেগুলি আমাদের আনন্দ দেবে বলেই আমরা করি। কিন্তু রূপকথার সেই তিনটি ইচ্ছার মতো সেগুলি পেলে আমরা হতাশ হয়ে যাই। অনেক অর্থ সম্পদ যখন পাই তখন সেগুলি কিভাবে ব্যয় করবো কিংবা কিভাবে রক্ষা করবো তা নিয়ে ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ি। ধনীলোক চিন্তা করে যে তার বন্ধু-বান্ধবেরা তাকে, না তার অর্থ-বিত্তকে মূল্য দিচ্ছে! এবং এটাও এক ধরনের মানসিক দুঃখ। আমাদের যা আছে, তা অর্থ-বিত্ত হোক কিংবা একান্ত প্রিয়জন হোক কখন যে হারিয়ে ফেলি সেই ভয়-ভাবনায় সবসময় ভীত থাকি। কাজেই আমরা যাকে 'সুখ' বলি তা যদি একান্ত নিবিষ্ট চিত্তে পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে দেখবো যে সেটা এক ধরনের

মনের মরীচিকা বা মায়া-বিভ্রম। সেটা কখনো সম্পূর্ণ ধরাছোঁয়া যায় না, সেটার পূর্ণতাও কখনো আসেনা কিংবা যৎসামান্য এলেও তার সংগে থাকে হারানোর উদ্বেগ-ভীতি।

আপনার অর্থ-বিত্ত কেবল আপনার গৃহেরই সজ্জা-সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করতে পারে, আপনার নয়। আপনার নিজস্ব গুণাবলী ও পুণ্যকর্মই আপনাকে সুসজ্জিত করতে পারে। আপনার পোষাক-পরিচ্ছদ আপনার দৈহিক শোভা বাড়াতে পারে কিন্তু আপনাকে নয়। কেবল আপনার সদাচারই আপনাকে শোভিত করতে পারে।

সুখ লাভের জন্য এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত যা অবশ্যই যেন নিষ্কলুষ ও নিষ্কন্টক হয়। অন্য ব্যক্তির কিংবা অন্য কোন প্রাণীর দুঃখ-দুর্দশার কারণ ঘটিয়ে সুখ সম্ভোগ করার কোন অর্থ নেই। তাই বুদ্ধ বলেছেনঃ "যাঁরা অন্যের অনিষ্ট না করে জীবিকা অর্জন করেন, তাঁরাই সুখী-সৌভাগ্যবান।"

"সুখ এমন এক সুগন্ধি-সৌরভ যা আপনি নিজে কয়েক ফোঁটা না নিয়ে অন্যের ওপর বর্ষণ করতে পারেন না।"

আপনি হয়তো আপনার ইচ্ছা-অভিলাষ অনুসারে এই বিশ্বার পরিবর্তন করতে পারবেন না, কিন্তু সুখ সন্ধানের জন্য আপনার হৃদয় তো পরিবর্তন করতে পারবেন।

যে মঙ্গল কাজ করতে গিয়ে আপনি দুর্ভোগ-দুর্দশা ভোগ করেন তা দিয়ে আপনার মহত্তর সুখই অর্জন করা যেতে পারে।

"যদি আমরা সুখ পেতে চাই, তাহলে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা কিংবা অকৃতজ্ঞতা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা বন্ধ করতে হবে এবং দানের অন্তর্নিহিত আনন্দের জন্যই দান দিতে হবে। অকৃতজ্ঞতা প্রাকৃতিক আগাছার মতো। আর কৃতজ্ঞতা যেন গোলাপ ফুল। এটাকে লালিত-পালিত ও সযত্নে সংরক্ষণ করতে হবে।"

(ডি, কার্নেগী)

আপনার মন সংযত করুন

মানুষের মন তার শরীরের ওপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। মনকে যদি পাপকাজ এবং অশুভ চিন্তা করতে দেয়া হয় তাহলে এই মন বিপর্যয় সৃষ্টি করতে, এমনকি খুনও করতে পারে। কিন্তু এই মনই আবার অসুস্থ শরীরকে নিরাময় করতে পারে। মনকে যখন সৎ প্রচেষ্টা আর সমঝোতা-সমন্বিত সঠিক চিন্তায় কেন্দ্রীভূত করা যায় তখন তা বিপুল শক্তিই সৃষ্টি করতে পারে। পবিত্র ও শুভ চিন্তাযুক্ত মন বাস্তবিকই সুস্থ সুন্দর জীবন পরিবেশ গড়ে তোলে।

বুদ্ধ বলেছেন ঃ "কোন মানুষের তীব্র লোভ লালসার চিন্তা, ঘৃণার চিন্তা, ঈর্ষার চিন্তা এবং এ ধরনের কু-চিন্তা তার যত বেশী ক্ষতি করতে পারে, ততটুকু তা কোন শত্রুও পারে না।"

যে মানুষ ঘটনা-পরিস্থিতি অনুসারে নিজের মনকে সমন্বয় সাধন করতে জানে না, সেই মানুষ কফিনের মধ্যে মৃতদেহের মতো হয়ে যাবে।

আপনার মন নিজের দিকেই ফিরিয়ে রাখুন এবং নিজের মধ্যেই আনন্দ পেতে সচেষ্ট হোন। সেখানে দেখবেন, আপনার উপভোগের জন্য বিপুল অগাধ আনন্দের উৎসই সঞ্চিত রয়েছে।

এ আনন্দ একমাত্র তখনই সম্ভবপর, যখন মনকে সংযত-নিয়ন্ত্রিত করে নিজের সমাজের কল্যাণের জন্য সঠিক পথে পরিচালিত করা হয়। চঞ্চল বিক্ষিপ্ত মন তার মালিক ও অন্যান্য সকলের দুর্বহ বোঝা স্বরূপ। যেসব মানুষ মনকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করতে জানে না তাদের দ্বারা বিশ্বের নানা অঘটন ও বিপর্যয় ঘটে থাকে।

শান্ত-সৌম্য অবস্থা দুর্বলতা নয়। রুচিশীল সংস্কৃতিবান মানুষ সকল সময়েই শান্ত মনোভাব দেখিয়ে থাকেন। পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে শান্তভাব বজায় রাখা মানুষের পক্ষে তেমন কঠিন নয়; কিন্তু পরিস্থিতি খারাপ হলে শান্ত সৌম্য হয়ে থাকা বাস্তবিক কঠিন ব্যাপার। এই কষ্টসাধ্য গুণ অর্জন অত্যন্ত দুরূহ-দুর্লভ। কারণ এ ধরনের শান্ত সৌম্যভাব ও সংযত আচরণের দ্বারা মানুষ তার চারিত্র শক্তি গড়ে তোলেন। যারা গোলমাল-কোলাহলকারী, বাচাল ও অনর্থক হৈ-চৈকারী ব্যস্তবাগীশ তারাই কেবল শক্তিশালী আর ক্ষমতাবান একথা ভাবা একান্তই ভুল।

বিজ্ঞভাবে কাজ করুন

মানুষকে তার যৌবন, সম্পদ, ক্ষমতা, শক্তি এবং জ্ঞান কিভাবে উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত স্থানে এবং যথাযথ উপায়ে নিজের কল্যাণ এবং সংগে সংগে অপরের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে হয় তা অবশ্যই জানতে হবে। যদি এ ধরনের সুযোগ-সুবিধার তিনি অপব্যবহার করেন, তা কেবল তাঁর পতনই ডেকে আনবে। মানুষকে অবশ্যই দুর্বলকালে পর্যাপ্ত শক্তিশালী, ভয়-ভীতি মোকাবেলায় বিপুল সাহসী, ন্যায়সংগত পরাভবে গর্বিত ও অনমনীয় এবং বিজয়ে বিনয়ী ও ভদ্র হবার গুণাবলী অর্জন করতে হবে।

কিছু লোক হঠাৎ ভাগ্য বলে বিপুল অর্থ-বিত্তের কিংবা সম্পদের অধিকারী হয়ে যায়, অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে পিতামাতার বিশাল বৈভবের অংশ পেয়ে থাকে। কিন্তু এই নতুন অর্জিত ধন-সম্পদ বিত্ত-বৈভব কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়, তা তাদের মধ্যে খুব স্বল্প লোকেই জানে। নিজেদের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম ছাড়া সহজ ভাবে অর্জিত সম্পদের যথার্থ মূল্য স্বভাবতঃ তাদের কাছে তেমন নেই। কাজেই তারা অপ্রয়োজনীয় কাজে অর্থ ব্যয় শুরু করে এবং এভাবে সমস্ত সম্পদ শীঘ্রই অপচয় হয়ে যায়। অপচয়-অপব্যয় না করে নিজেদের ধন-সম্পদ কিভাবে কাজে লাগানো যায় তা অবশ্যই জানতে হবে এবং এ জন্য একটু সাধারণ বুদ্ধির প্রয়োগ করলেই চলবে।

•

নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করুন

আমরা চির পরিবর্তনশীল জগতেই বাস করছি। কিন্তু খুব কম লোকেই এ বিষয়টি উপলব্ধি করে। প্রাচীন পূর্ব-পুরুষদের প্রবর্তিত রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, ঐতিহ্য-সংস্কার, অভ্যাস-বিশ্বাস ইত্যাদি অন্ধভাবে অনুসরণ করতে হবে তেমন কোন কথা নেই। যদি কেউ মনে করে থাকে যে, সেই প্রাচীন আচার-ব্যবহার তা অবশ্যই মেনে চলা উচিত তা হলে সেটা তার সংকীর্ণ-মানসিকতাই বলতে হবে। এ ধরনের সংকীর্ণ-মনা লোকদের দিয়ে আমাদের সমাজে কোন প্রগতি আসবে না। প্রাচীন পূর্বপুরুষদের প্রবর্তিত রীতি-নীতির মধ্যে কিছু ভালো থাকতে পারে, তবে সে-গুলো আধুনিক সমাজের পক্ষে উপযোগী কিনা তা অবশ্যই বিবেচনা করে দেখতে

হবে। অপর দিকে মাতা পিতা ও বয়স্ক লোকেরা তাদের তরুণ বংশধরদের অনুসৃত আধুনিক জীবনধারা খুব কদাচিৎ সহ্য করে থাকেন। তাঁদের ছেলে-মেয়েরা সেই প্রাচীন রীতি-নীতি ও ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলুক এটা দেখতেই তাঁরা সমধিক আগ্রহী। এটা কিন্তু অবশ্য খুব ভালো মনোভাব নয়। নির্দোষ হলে কালের সাথে সংগতি রেখে চলার জন্য ছেলেমেয়েদের অনুমতি দিন। মাতাপিতাকে কেবল একথা মনে রাখতে হবে যে, তাঁদের তারুণ্যের সময়ে তদানীন্তন আধুনিক জীবনধারার ব্যাপারে তাঁদের মাতাপিতারা কিভাবে আপত্তি জানিয়েছিলেন। রক্ষণশীল লোক এবং তরুণ বংশধরের মধ্যেকার এই বিরোধ কিন্তু সমাজের প্রগতির পক্ষে সুস্থ ও মঙ্গলজনক লক্ষণ নয়। অবশ্য, আধুনিক সমাজের বিকৃত নির্দেশের দরুণ ছেলেমেয়েরা যদি বিপথগামী হয়, তাহলে তাদের সদুপদেশ ও নির্দেশ দিতে ইতস্ততঃ করা কোন মাতাপিতারই উচিত নয়।

আপনাকে অন্য মানুষের মতামত ও রীতি-নীতি অবশ্যই সহ্য করতে হবে। এমনিক সেগুলি আপনার পছন্দ না হলেও, কিভাবে তা সহ্য করা যায় সেই উপায়টুকু জানতে হবে। এখানে সহ্য করার অর্থ, সেই আদর্শ ও ভাবধারা আপনাকে অনুসরণ করতে হবে তেমন বোঝায় না।

প্রতিটি মানুষ বিশ্বমানবেরই অংশ বিশেষ। বিশ্ব মানবের মধ্যে যা কিছু ঘটছে তার জন্য প্রতিটি মানুষই দায়ী। মানুষকে অবশ্যই আত্মজিজ্ঞাসু হতে হবে। কল্যাণকর কোন কাজ নিজে করছে কিনা তা প্রতিটি মানুষকে নিজে নিজে প্রশ্ন করতে হবে। এই নীতিবোধের মাধ্যমেই জীবন গুরুত্ববহ ও উৎসাহউদ্দীপক হয়ে ওঠে। এ ধরনের জীবনই প্রকৃত সুখময় জীবন। এই সুখময় জীবন পেলেই আমরা বর্তমান অবস্থা পরিস্থিতি কল্যাণজনক করে তোলার অবকাশ পাব।

আপনাকে কেউ ঠাট্টা-পরিহাস করলে এবং আপনার প্রতি কোন মন্তব্য করলে তা যতোই তিক্ত-কঠোর হোক না কেন, কোনরূপ ঝগড়া না করে একজন বিজ্ঞ-জ্ঞানী মানুষের মতো পাল্টা ঠাট্টা-পরিহাসের মাধ্যমেই আপনাকে সেই জবাব দিতে হবে।

কোন খেলাধূলায় আপনি হেরে যাচ্ছেন, কখনও মেজাজ বিগড়াবেন না। মেজাজ তিরিক্ষি করলে খেলায় অন্যদের আনন্দই কেবল মাটি করলেন

না, পরিণামে সম্পূর্ণ খেলাটিই পন্ড করে দেবেন।

সুখে-আরামে চলাফেরার জন্য আপনি যেমন পথের সকল কাঁটা ও পাথর অপসারণ করতে পারেন না, তেমনি শান্তি অর্জনের জন্য অনুরূপভাবে আপনি এ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে সংশোধন করতে পারবেন না। যিনি আরামে হাঁটতে চান, তাঁকে অবশ্যই একজোড়া জুতো পরতে হবে। তদ্রূপ, যিনি মনের শান্তি পেতে আগ্রহী, তাঁকে নিজের বুদ্ধি-বিবেক নিয়ন্ত্রণের কৌশল জানতে হবে।

কোন ব্যক্তি ভুলপথে চললে তাকে সংশোধনের বিভিন্ন উপায় আছে। প্রকাশ্যে সমালোচনা, নিন্দা ও তিরস্কার করে আপনি তাকে সংশোধন করতে পারবেন না। তাকে অপমানিত না করে কিভাবে সংশোধন করা যায়, তা আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে। অনেক লোক অন্যের সমালোচনা করে অধিক শত্রু সৃষ্টি করে ফেলে। আপনি যদি তাকে সংশোধনের মনোভাব নিয়ে সদয়ভাবে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন তা হলে সে নিশ্চয়ই আপনার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং কোন এক সময়ে সে আপনার নির্দেশ-উপদেশ ও দয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাবে।

যখন কোন বিষয়ে আপনি মতামত ব্যক্ত করেন তখন সবসময় এমন শব্দাবলী ব্যবহারের চেষ্টা করবেন যাতে অন্যের অনুভূতিতে আঘাত না লাগে। আপনার মতামত ভদ্রভাবে কিংবা বিনম্রভাবে অথবা এমনকি কূটনৈতিকভাবে প্রকাশের বিভিন্ন উপায় রয়েছে।

আপনার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ হয়ে পড়লে তাতে মেজাজ খারাপ করা অনুচিত। আপনি হয়তো ভাবতে পারেন যে, মেজাজ দেখিয়ে এবং অন্যকে বকাঝকা করে আপনি আপনার দোষ-ত্রুটি ঢাকতে কিংবা কাটাতে পারবেন। এটা কিন্তু ভ্রান্ত ও মিথ্যা ধারণা।

কোন বন্ধু আপনার নিকট তার ব্যক্তিগত গোপনীয় কথা কিছু বলে থাকলে তা অন্যের নিকট কখনও প্রকাশ করবেন না, এমনকি তাঁর সঙ্গে আপনার ভাল সম্পর্ক না থাকলেও। আপনি যদি তা-ই করেন, তাহলে অন্য লোকে আপনাকে হেয় চোখে দেখবে এবং আপনাকে কখনো অকপট ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করবে না।

নিরপেক্ষ হোন

খারাপ মেজাজে কিংবা বিরক্ত অবস্থায় থাকলে কোন বিষয়ের ব্যাপারে কোনরূপ তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয়া আপনার কিছুতেই উচিত নয়। ভাবাবেগে খোশ মেজাজে থাকলেও নয়। কেননা, এ অবস্থায় আপনার মন থাকবে ভাবাবেগে আপ্লুত এবং ঐ সময়ে গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত বা সংকল্প এমন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে যা একদিন গভীর পরিতাপ সৃষ্টি করতে পারে। প্রথমে আপনার মনকে শান্ত সমাহিত করে তুলুন এবং বিষয়টা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন। তারপরই আপনার সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষ হবে।

সহিষ্ণুতার অনুশীলন করুন। কারণ, এই সহিষ্ণুতাই আপনাকে ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ পরিহারে, অন্য লোকের দুঃখকষ্টে সহানুভূতি প্রকাশে, কূট-কঠোর সমালোচনা পরিত্যাগে, এমনকি সুন্দরতম মানুষও যে অভ্রান্ত নয় একথা অনুধাবনে একান্তভাবে সাহায্য করবে। আপনার প্রতিবেশীদের মধ্যে যে দুর্বলতা আপনি দেখতে পান তা আপনার নিজের মধ্যেও পরিলক্ষিত হতে পারে।

বিনয়

বিনয় হচ্ছে ঃ "কি হয় এবং কি নয় এর পার্থক্য জানার জন্য জ্ঞানীলোকের মাপকাঠি।" বুদ্ধ নিজেই তাঁর যুবরাজ সুলভ সকল গর্ব-দম্ভ পরিত্যাগ করে সবিনয়ে কাজের মাধ্যমে তাঁর সংঘ-ধর্মের উদ্বোধন করেছিলেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বুদ্ধত্ব-সিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু কখনো তাঁর স্বাভাবিকতা হারাননি, কখনো অলৌকিক কল্পনাকে গ্রহণ করেননি। তাঁর আলাপ-আলোচনা ও উপদেশপূর্ণ গল্পগুলি কখনো গুরুগম্ভীর শব্দ-আড়ম্বরে কন্টকিত ছিল না। জনগণের জন্য তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনম্র-বিনয়ী। তিনি কখনো তাঁর মানবিক কৌতুকবোধ বিসর্জন দেননি।

সময়ের অপচয় করবেন না

অতীত নিয়ে বিলাপ করা মানুষের নিজের অস্তিত্বেরই অপচয়। আলস্য ও অমনোযোগিতা যে কোন মহৎ পদমর্যাদার জন্য অনুপযুক্ত। এতে

দুষ্কর্মই ডেকে আনে। একথা গভীরভাবে অনুধাবন করে আজীবন ভালো কাজে ব্রতী হোন, কল্যাণ করে যান। সময়ের অপচয় করে শুধু নিজের নয়, অন্যেরও ক্ষতি করছেন। কারণ আপনার সময়টুকু অন্যের জন্যও প্রয়োজনীয়।

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা

সবকিছুতে ধৈর্যশীল হোন। ক্রোধ মানুষকে বিপথগামী করে তোলে। ক্রোধ শুধু অন্যকে উত্যক্ত ও বিরক্ত করেনা, নিজেরই ক্ষতিসাধন করে। এটা শারীরিক দুর্বলতা যেমন আনে, তেমনি মানসিক প্রশান্তিরও ব্যাঘাত ঘটায়। একটি কর্কশ-কঠোর শব্দ ধনু থেকে নিক্ষিপ্ত তীরের মতো। এর জন্য হাজার বার মার্জনা চাইলেও আপনি তা ফিরিয়ে নিতে পারবেন না।

কোন কোন প্রাণী দিবাকালে দেখতে পায়না, আর কিছু প্রাণী রাত্রিতে থাকে অন্ধ। কিন্তু কোন মানুষ চরম ঘৃণা বিদ্বেষে জর্জরিত বিক্ষুব্ধ থাকলে দিনে কিংবা রাত্রে কোন সময়েই কিছু দেখতে পায় না।

যখন আপনি ক্রোধান্বিত তখন কার সাথে এবং কি নিয়ে সংঘাত করছেন? আপনি তখন নিজের সাথেই সংঘাতে লিপ্ত। কেননা, আপনি নিজেই আপনার চরম শত্রু। মন আপনার উত্তম মিত্র এবং অধম শত্রু। যে লোভ-লালসা, কাম-ক্রোধ, ঘৃণা-বিদ্বেষ, অবিদ্যা-অজ্ঞতা আপনার মনকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে সেই রিপুসমূহ বিনাশ সাধনের জন্য অবশ্যই আপনাকে চেষ্টা করতে হবে। নৈতিকতা, একাগ্রতা, প্রজ্ঞা প্রভৃতি গুণাবলীর সাহায্যে এই রিপুসংহারে আপনাকে তৎপর হতে হবে।

বিক্ষোভ, ঘৃণা ও ঈর্ষা দীর্ঘকাল পুঞ্জীভূত হলে দেখা দেয় নানা ধরনের হৃদরোগ, বাতব্যাধি ও চর্মরোগ। কেননা, ধ্বংসাত্মক যে কোন ধরনের চিন্তা-ভাবনা আবেগ অনুভূতি হৃদযন্ত্রকে বিষিয়ে তোলে। এসব দূষিত চিন্তাভাবনা সুপ্ত ব্যাধিপ্রবণতাকে জাগিয়ে তোলে এবং রোগ-জীবাণুকে ডেকে আনে।

মন্দের জন্য ভাল চাই

আপনি যদি আপনার শত্রুদের কবল থেকে পরিত্রাণ পেতে চান তাহলে প্রথমে আপনার ক্রোধকেই সংহার করতে হবে। কারণ এই ক্রোধ

হচ্ছে আপনার অন্তরের সর্বপ্রধান শত্রু।

আপনার শত্রুদের কথাবার্তা শুনে আপনি যদি বিচলিত হয়ে পড়েন তাহলে তার অর্থ হচ্ছে, আপনি অজ্ঞাতসারে শত্রুদের ফাঁদে ঢুকে তাদেরই অভিসন্ধি পূরণ করছেন।

যারা আপনার প্রশংসা করে, সাহায্য করে এবং খুব ঘনিষ্ঠভাবে আপনার সাথে সংশ্লিষ্ট আছে, কেবল তাদের কাছ থেকেই যে আপনি কিছু শিখতে পারেন, একথা কোনদিন ভাববেন না। অনেক জিনিস আছে যা আপনি আপনার শত্রুদের কাছ থেকেও শিখতে পারেন। আপনার শত্রু বলে তারা যে সর্বাংশে খারাপ এমন কথা ভাবা অনুচিত। তাদেরও কিছু সদ্‌গুণ নিশ্চয়ই থাকতে পারে।

মন্দের বদলে মন্দ দিয়ে আপনি কখনো আপনার শত্রুদের কবল থেকে মুক্তি পাবেন না। আপনি যদি মন্দের বদলে মন্দ ব্যবহারই করেন তাহলে কেবল আরো শত্রুতাই সৃষ্টি করবেন। শত্রুদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করাই শত্রুতার কবল থেকে পরিত্রাণের উত্তম ও সঠিক উপায়। আপনি ভাবতে পারেন, এটা অসম্ভব অথবা নির্বোধ উপায়। কিন্তু প্রতিটি রুচিশীল সংস্কৃতিবান মানুষের কাছে এই নীতি অত্যন্ত উচ্চপর্যায়ে প্রশংসিত। যখন আপনি জানতে পারলেন যে আপনার প্রতি কোন ব্যক্তি বিশেষ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ-বিরক্ত তখন আপনার প্রথমেই উচিত সেই বিদ্বেষ-বিরাগের প্রধান কারণটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করা। যদি আপনার ভুলের দরুন এটা হয়ে থাকে তাহলে সেই ভুল স্বীকার করা এবং প্রতিপক্ষের নিকট অগৌণে ক্ষমা চাওয়া একান্তই সমীচীন। যদি সেই বিরোধ আপনারা দু'জনের মধ্যে কিছু ভুল বুঝাবুঝির দরুন হয়ে থাকে, তাহলে আপনাকে প্রতিপক্ষের সাথে আন্তরিকভাবে আলাপ-আলোচনা করে প্রকৃত ব্যাপারটি সম্পর্কে আলোকপাতের চেষ্টা চালাতে হবে। যদি সেই বিরোধ বিদ্বেষ ঈর্ষা অসূয়া কিংবা অন্য কোন ভাবাবেগ জনিত কারণে হয়ে থাকে, তাহলে আপনাকে তার প্রতি এমন মৈত্রীময় দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতে হবে যাতে করে আপনার মানসিক প্রভাব-প্রতিপত্তির মাধ্যমে তাকে আপনি প্রভাবিত করতে সক্ষম হন। এটা কিভাবে কার্যকরী হয় তা হয়তো আপনি না-ও জানতে পারেন, কিন্তু বহু লোকের অভিজ্ঞতায় এটা দেখা গেছে যে এই উপায়টি হচ্ছে

অত্যধিক শক্তিশালী, বুদ্ধিদীপ্ত ও সহজতম পদ্ধতি। বৌদ্ধধর্মে এটার অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা রয়েছে। অবশ্য এটা করতে হলে আপনাকে নিশ্চয়ই দৃঢ় প্রত্যয় ও ধৈর্য ধারণ করতে হবে। এটা করার মাধ্যমে আপনি আপনার শত্রুকে বোঝাতে সক্ষম হবেন যে তারই ভুল হয়েছে। তদুপরি আপনার মনে শত্রুতা পোষণ না করার ফলে আপনি বিভিন্নভাবে উপকৃতও হয়েছেন।

প্রীতিময় দয়া

এমন প্রাণী আছে যাকে প্রীতিপূর্ণ কথায় আপনি সান্ত্বনা দিতে পারেন, আপনার প্রীতি-সান্নিধ্য দিয়ে পারেন তাকে উজ্জীবিত-উল্লসিত করে তুলতে, আপনার পার্থিব সম্পদের মাধ্যমে তার দুঃখ কষ্ট পারেন লাঘব করতে, সেই দান যতোই তুচ্ছ-নগণ্য হোক না কেন, আপনি কিন্তু সমগ্র মানব জাতির জন্য মূল্যবান সম্পদ। কাজেই আপনার কখনো কিছুতেই হতাশ কিংবা নিরুৎসাহিত হওয়া উচিত না।

এমন সময়ও আসতে পারে যখন আপনি যাদেরকে ভালবাসেন তারা আপনার কোন তোয়াক্কা করে না। এসব ভেবে আপনার অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু এ ধরনের বিষণ্নতার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই। আপনি যতক্ষণ জানেন যে, অন্যের জন্য আপনার হৃদয় মৈত্রী-করুণা, প্রীতি শুভেচ্ছায় পরিপূর্ণ, ততক্ষণ আপনার প্রতি কে কৃতজ্ঞ, না অকৃতজ্ঞ কিংবা কেউ আপনার তোয়াক্কা করছে, কি করছে না তাতে কি আসে যায়? একজনের সুখের জন্য কখনো অন্যের ওপর নির্ভর করা ঠিক নয়। যে ব্যক্তি জীবনে অন্যের কাছ থেকে সন্তুষ্টি লাভের আশা করে সে ব্যক্তি প্রাত্যহিক খাবারের জন্য নতজানু এক ক্রন্দনরত ভিখারীর চেয়ে নিকৃষ্ট ও অধম।

মাতলামি

মাতলামি যুক্তি-নীতি কিছুই মানে না,
বিলোপ করে দেয় স্মৃতিশক্তি,
বিকৃত করে ফেলে মেধা-মস্তিষ্ক,
শক্তি সামর্থ্যের করে অবক্ষয়,

রক্তকে করে উত্তাল-উত্তেজিত,
সৃষ্টি করে দুরারোগ্য নানা ব্যাধি।
যে ব্যক্তি মাতাল, তার শরীর কুৎসিত
প্রেত সদৃশ, মন তার হয়ে যায়
নানা শয়তানিতে পরিপূর্ণ।
মাতালের ধনসম্পদ কিছুই থাকে না,
সে যেন ভিক্ষুকের অভিশাপ,
দারা-পুত্র পরিবারের সে হয়ে যায়
বড় শত্রু, দুঃখ দুর্দশার কারণ,
সে যেন পশুর প্রতিমূর্তি,
এক আত্মঘাতী ভয়ংকর পাষণ্ড;
মদ্য পান করে করে যে হয় মাতাল
সে শুধু ডেকে আনে নিজের সর্বনাশ।

মাতলামির পরিণতিফল চরম শারীরিক ও মানসিক অধঃপতন ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

সুসমঞ্জসভাবে বাস করুন

বিশ্ব ইতিহাস বলছে ঃ গোত্র বিভেদ, বর্ণ বৈষম্য, ধর্মান্ধতা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সম্পদের লিপ্সা এই পৃথিবীতে বহু দুঃখ-দুর্দশা ও দুর্ভোগ গোলযোগের সৃষ্টি করেছে এবং নির্মম উপায়ে বিপুল প্রাণহানি ঘটিয়েছে। শান্তি ও সুখের স্বার্থে এসব বিষয় কখনো কোনদিন কোন অবদান রাখেনি। যেসব লোক ক্ষমতা ও সম্পদের জন্য লালায়িত এবং ঈর্ষায় জর্জরিত তারাই সবসময় অনর্থের সৃষ্টি করে এবং তারাই সবসময় বাজে কথা বলে ও অন্যকে আঘাত দিয়ে নিজেদের ক্রুর-কুটিল কার্যকলাপকে যুক্তিসংগত করার প্রয়াস চালায়। আমরা এমন বিশ্বে বাস করছি যা দৈহিকভাবে ঐক্যবদ্ধ বটে, কিন্তু মানসিকভাবে বহুধা বিভক্ত।

"আপনি যদি এ বিশ্বে শান্তিপূর্ণভাবে ও সুখে থাকতে চান, তাহলে অন্যকেও শান্তিতে ও সুখে থাকতে দিন। এবং এতেই আপনি এ বিশ্বের জন্য মূল্যবান কিছু করতে সক্ষম হবেন।" এই মহৎ আদর্শ অনুসারে জীবন যাপনে

যতক্ষণ না আপনি নিজেকে সমন্বয় করতে পারছেন, ততক্ষণ এই পৃথিবীতে সুখ শান্তি আপনি প্রত্যাশা করতে পারবেন না। শুধু প্রার্থনা করে স্বর্গ থেকে এই সুখ শান্তি আপনি পাবেন না। আপনি যদি নৈতিক আদর্শ অনুসারে কাজ করেন, তাহলে এই পৃথিবীতেই আপনার নিজস্ব স্বর্গ গড়ে উঠতে পারে। যদি বিপরীত কাজ করেন, তাহলে এ পৃথিবীতে আপনি নরক কুন্ডের দাহজ্বালাই ভোগ করবেন। প্রাকৃতিক ও মহাজাগতিক বিধিবিধান অনুসারে জীবন যাপনের প্রণালী না জানার ফলেই দুঃখ কষ্ট দেখলে আমরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠি। অন্যের সমালোচনা না করে ক্ষোভ-অভিযোগ বাদ দিয়ে প্রত্যেকে যদি নিজের সাথে নিজেই সমঝোতা-সমন্বয় সাধনের প্রয়াসী হই, তাহলে প্রকৃত স্বর্গীয় পরিবেশ এখানেই আমরা উপভোগ করতে পারি। পুণ্যের পুরস্কারের জন্য অন্য কোথাও স্বর্গ সৃষ্টির কিংবা পাপের শাস্তি বিধানকল্পে নরক সৃষ্টির প্রয়োজন নেই। এই বিশ্বে পুণ্য ও পাপের অপরিহার্য প্রতিক্রিয়া আছে। এ ব্যাপারে আপনার বিশ্বাস অনাবশ্যক। এটা এমন এক মহত্তম উপায় যা দিয়ে আপনি আপনার সমাজ ও দেশের কল্যাণে সাহায্য করতে পারেন। অন্যের সুখে-শান্তিতে ও সমৃদ্ধিতে কিছু লোকের সমঝোতা-সম্প্রীতি ও সমমর্মিতা রয়েছে বলেই বর্তমানে মানবসমাজ উন্নতির এই পর্যায়ে এসেছে। কাজেই নৈতিকতা অনুশীলন করা কেন উচিত তা আপনি নিশ্চই এখন অনুধাবন করতে পারছেন। অপরপক্ষে, আপনাকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে অপরকে নৈতিকভাবে সাহায্য করে, আপনি নিজেরই সাহায্য করছেন এবং নিজেকে নৈতিকভাবে সাহায্য করে আপনি অন্যকেও সাহায্য করে চলছেন ঃ

"কাজ করি, স্বপ্ন দেখি, আর তা-ই নিয়ে
বেঁচে আছি আমরা মানুষ,
আমাদের প্রত্যেকের ছোটখাটো
কতো সাধ রয়েছে সতত;
কখনো হাসিতে উজ্জ্বল হই,
ভেঙে পড়ি কখনো কান্নায়,
এইভাবে আমাদের দিনগুলি চলে যায়
বহে যায় নদীর স্রোতের মতো।"

সুখী বিবাহিত জীবন

সত্যিকার বিবাহিত জীবনে নর ও নারী উভয়ে স্বকীয় কাজকর্মের চেয়ে যৌথ অংশীদারিত্ব সম্পর্কেই অধিকতর চিন্তা করে থাকে। এটা হচ্ছে আন্তঃপারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপার এবং উভয়ের স্বার্থে একত্রে আত্ম উৎসর্গের উদ্যোগ। এটার নিরাপত্তা ও সন্তুষ্টির অনুভূতি সৃষ্টি হয় পারস্পরিক প্রচেষ্টা থেকে।

স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে এবং তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে অধিকাংশ গোলমাল ও অশান্তি ঘটে থাকে ভুল বুঝাবুঝি এবং অধৈর্য-অসহিষ্ণুতার দরুন। স্ত্রীকে দাসী হিসেবে ব্যবহার করা স্বামীর উচিত নয়। স্বামী রুটি-রুজির দায়িত্বে থাকলেও অবসর সময়ে ঘর গৃহস্থালীর কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করা তার প্রয়োজন। অপরদিকে গৃহে কোনকিছুর অভাব ঘটলে সে জন্য স্বামীকে সব সময় বিরক্ত কিংবা নালিশ করা স্ত্রীর অনুচিত। স্বামী সম্পর্কে সন্দেহ-পরায়ণ হওয়াও স্ত্রীর ঠিক নয়। যদি স্বামীর প্রকৃত কিছু দুর্বলতা থেকেও থাকে তাহলে স্ত্রী মধুর ব্যবহারে সদালাপে তা সংশোধন করতে পারেন। স্বামীকে বিরক্ত না করে একজন স্ত্রীকে অনেক কিছু সহ্য করে নিতে হয়।

বিবাহ এক অনাবিল আশীর্বাদ। কিন্তু অনেক লোক সমঝোতা, সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের অভাবে তাদের বিবাহিত জীবনকে অভিশাপে পরিণত করে। স্বামী ও স্ত্রীকে তাদের দৈনন্দিন জীবনের আনন্দ-বেদনা প্রত্যেক কিছুই সমভাবে গ্রহণ করার শিক্ষা অবশ্যই নিতে হবে। পারস্পরিক সমঝোতাই একটি সুখী পারিবারিক জীবনের গোপন চাবিকাঠি।

সমালোচনা মেনে নিন

মিষ্টতা হচ্ছে ব্যাধি, আর তিক্ততা হচ্ছে ঔষধ। প্রশংসা হচ্ছে মিষ্টির মতো যার আধিক্যে দেখা দেয় ব্যাধি। আর সমালোচনা হচ্ছে তিক্ত বটিকা কিংবা বেদনাদায়ক ইনজেকশানের মতো, এতে ব্যাধির নিরাময় ঘটে।

সমালোচনাকে স্বাগত জানানোর জন্য আমাদের অবশ্যই সৎসাহস থাকতে হবে এবং এতে ভীত হলে চলবে না।

"অন্যের মধ্যে যে কদর্যতা আমরা দেখি,
তা আমাদের নিজস্ব স্বভাবেরই প্রতিচ্ছবি।"

একজন মানুষের ব্যক্তিগত জীবন ঘটনা পরিস্থিতি ও বিশ্ব তার স্বকীয় চিন্তাধারা ও বিশ্বাসেরই প্রতিফলন। সকল মানুষই দর্পণ বিশেষ, তাতে তাদের নিজস্ব পরিমন্ডলই প্রতিফলিত হয়ে থাকে। বিশ্বের জীবন ও বস্তুর দিকে অবলোকনকারী সকল মানুষ এমন এক দর্পণের দিকে তাকাচ্ছে যাতে তাদের নিজস্ব প্রতিচ্ছবিই বারংবার প্রতিবিম্বিত হচ্ছে।

নিজের কাজে মন দিন

অন্যের কাজ-কারবারে অধিক হস্তক্ষেপ না করে কিংবা নাক না গলিয়ে যদি আপনি নিজের কাজ-কারবারে মনোনিবেশ করতে পারেন, তাহলে তা কতো সুন্দরই না হয়। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধের উপদেশ হচ্ছে ঃ

"অন্যের দোষ-ত্রুটি দেখা এবং অন্যে কি করেছে, না করেছে তা নিয়ে বলাবলি করা কারো উচিত নয়, নিজের কাজ কি হচ্ছে, না বাদ যাচ্ছে তা দেখাই বাঞ্ছনীয়।"

তথাগত বুদ্ধ আরও বলেন ঃ "যে ব্যক্তি অন্যের দোষ-ত্রুটি বেশি দেখে, সে সবসময় তার নিজের কলুষ মনোভাব বৃদ্ধির দরুন কোপন-ক্রুর হয়ে থাকে। কলুষ-কদর্য মনোভাব পরিহার করা তার পক্ষে সুদূর পরাহত।"

বুদ্ধ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলছেন ঃ "অন্যের দোষত্রুটি দেখা খুবই সহজ, কিন্তু নিজের দোষ-ত্রুটি দেখা বড়ই কঠিন। যে ব্যক্তি অন্যের তুচ্ছাতিতুচ্ছ দোষ-ত্রুটি তুষ-ভূষির মতো চালা-ঝাড়া করে, সে আসলেই ধূর্ত ব্যাধের মতো নিজের গোপন-আস্তানা আর ত্রুটি-বিচ্যুতি সবসময় ঢেকে রাখছে।"

"সাধু ব্যক্তি যে কোন পরিস্থিতিতেই ন্যায় পথ থেকে বিচ্যুত হন না এবং পার্থিব আনন্দের জন্যও কখনো লালায়িত হয়ে পড়েন না। আনন্দে ও বেদনায় জ্ঞানী ব্যক্তির মন সর্বদা শান্ত ও অবিচল থাকে।"

অন্যের দ্বারা নিন্দিত ও সমালোচিত না হয়ে কেউ এ পৃথিবীতে বাস

করতে পারে না। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলছেন ঃ "লোকেরা অন্যকে তাদের নীরবতার জন্য দোষারোপ করে। যারা বেশি কথা বলে এবং যারা মিতবাক তাদেরও তারা নিন্দা করে। কাজেই এ পৃথিবীতে অনিন্দিত কোনো কেউ নেই।" তিনি আরো বলছেন ঃ "সামগ্রিকভাবে নিন্দিত কিংবা সামগ্রিকভাবে নন্দিত কোনো কেউ কখনো ছিলেন না কখনো হবেন না এবং এখনো নেই।" যারা আপনার সমালোচনা করে তারা সবাই আপনার শত্রু নয়। আপনার যে দুর্বলতা আপনি দেখতে পাচ্ছেন না তা খুঁজে দেখার সুযোগ এই সমালোচনার মাধ্যমে পেতে পারেন।

সমালোচনার দরুন ভাল কাজ পরিত্যাগ করা আপনার উচিত নয়। সমালোচনা সত্ত্বেও আপনার ভাল কাজ করে যাওয়ার যদি সৎসাহস থাকে, তাহলে আপনি বাস্তবিক মহৎ ব্যক্তি এবং সর্বত্রই আপনি সাফল্য অর্জন করতে পারবেন।

উদ্বিগ্ন হবেন না

অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন না হয়ে বর্তমানে করণীয় কাজের জন্য যা প্রয়োজন তা সম্পাদনের মধ্যেই সুখী ও সফল জীবন যাত্রার গোপন রহস্য নিহিত। আমরা কিছুতেই অতীতে ফিরে যেতে পারি না এবং ভবিষ্যতে হতে পারে এমন সবকিছু আমরা অনুমান করতেও পারি না। কিন্তু সময়ের যে মুহূর্তের ওপর আমাদের কিছুটা সচেতন নিয়ন্ত্রণ রয়েছে সেটি হচ্ছে একমাত্র বর্তমান।

অনেক লোক নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে শুধু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। যদি তাঁরা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা-পরিস্থিতি অনুসারে নিজেদের সামঞ্জস্য বিধান করতে শেখেন, তাহলে তাঁদের উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই। আকাশ-কুসুম যতো কিছু কল্পনাই তাঁরা করুন না কেন; মনে মনে যতো স্বপ্নই তাঁদের থাক না কেন, তাঁদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে তাঁরা নিয়ত পরিবর্তনশীল এই পৃথিবীতে বাস করছেন।

ভালো হোন

"এমন কোনো তারা নেই,
নেই কোনো নির্দেশিকা আলো
যার ওপর ভরসা রেখে চলতে পারি
জীবনের অন্তহীন পথ;
আমাদের অবশ্যই জেনে নিতে হবে
কি করে হতে পারি ন্যায়বান,
সত্যনিষ্ঠ, উত্তম-মহৎ।"

নিজস্ব বই

সাফল্যের ভিত্তি স্তম্ভ

ব্যর্থতা কিন্তু সাফল্যের ভিত্তি স্তম্ভ। ব্যর্থতার জ্ঞান দিয়েই সাফল্য অর্জন করা যায়। যে কখনো ব্যর্থ হয়নি, সে কখনো সফলও হয়নি। ব্যর্থতা এবং তা[illegible]ুধঙ্গিক শক্তির অভিজ্ঞতা না থাকলে আমরা পরিপূর্ণ বিজয়কে বরণ [illegible] পারবো না। সেই সাফল্য কিংবা বিজয় কেবল সাধারণ ঘটনায় পর্যবসিত হয়ে যাবে, আমাদের কাছে তার তেমন আকর্ষণ-অনুরাগ থাকবে না। ব্যর্থতা শুধু আমাদের সাফল্য অর্জনে সহায়তা করে না, অধিকন্তু আমাদেরকে সদয়, সহানুভূতিশীল, সমমর্মী এবং বিপুল অভিজ্ঞতা সম্পন্ন করে তোলে।

সত্যিকার সৌন্দর্য

কেউ যদি কুৎসিৎ হয়ে জন্মগ্রহণ করে, তার মুখমন্ডল যতোই কদাকার হোক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। যদি সে প্রেম-প্রীতির অনুশীলন করে তাহলে তাতে দেখা দেবে এক অন্তর্নিহিত চিরন্তন মোহিনী শক্তি। সেই মোহনীয়তা বাইরে বিকশিত হয়ে তার সমগ্র সত্তায় এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে যার ফলে সে সকলের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। কারণ মোহনীয়তা হচ্ছে সত্যিকার সৌন্দর্য। মুখের গড়ন কিংবা বর্ণ নয়।

আমরা অত্যন্ত সুদর্শন নারী-পুরুষকে সাধারণতঃ পছন্দ করে থাকি। কোন এক সময়ে সেই নারী কিংবা পুরুষের প্রতি লোকেরা আকৃষ্ট না-ও

থাকতে পারে। কেননা সেই নারী কিংবা পুরুষের সৌন্দর্য নিজের অহংকার কিংবা গরিমার কারণে বিকৃতও হয়ে যেতে পারে। যে ব্যক্তি কুৎসিৎ অথচ অসীম প্রেম-প্রীতি ও মৈত্রী করুণায় পরিশীলিত, যার কথাবার্তা ভদ্র ও বিনম্র এবং অন্যের প্রতি আচরণ-ব্যবহার অত্যন্ত সদয় সংযত মার্জিত তাকেই বরণ করুন। দেখবেন, সেই ব্যক্তি প্রত্যেকের নিকট কতোই না আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে!

শান্তিপূর্ণ সমাপ্তি

মানুষের চিত্তবিক্ষেপ বস্তু দিয়ে নয়, বস্তু সম্পর্কিত ধারণা দিয়েই ঘটে থাকে। উদাহরণ হিসাবে মৃত্যুর কথাই ধরা যাক। মৃত্যু আসলে ভয়ংকর নয়: ভয় কেবল আমাদের মনেই নিহিত। এ জগতে দুঃখ-কষ্ট আছে একথা একান্ত সত্য। সেই দুঃখ-কষ্ট সত্যের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ কেবল ঘটনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় অক্ষম মনে বিকারই সৃষ্টি করে না, সুখের ফানুসও ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে।

এ জগতে বেঁচে থাকার দুর্বার আকাঙ্খা ও জীবন প্রীতি সব সময় অস্বাভাবিক অসুস্থ মৃত্যু ভীতিকেই উদ্দীপিত করে। এটার ফলে মানুষের মনে এমন বিষণ্নতা ও বিভ্রম দেখা দেয়, কোন কাজ-কর্মে সে উৎসাহ বোধ করে না। এমন কি নিজের ন্যায়সংগত অধিকার অর্জনেও এগিয়ে যায় না। কোন একটা ব্যাধি কিংবা দুর্ঘটনা কখন কোন মুহূর্তে তার ক্ষুদ্র প্রাণটুকু সংহার করে বসবে এই ভয়ে আতংকিতভাবেই সে জীবন যাপন করে। এটা বাস্তব সত্য যে মৃত্যু অনিবার্য। এই অনিবার্য পরিণতির অযৌক্তিক ভয়-ভীতি বিশ্বের বিষয়াসক্ত মানুষের মনে স্বকীয় আত্মাকে স্বর্গে বাঁচিয়ে রাখার প্রবল আকাঙ্খা সৃষ্টি করে। এ ধরনের ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্খার প্রচন্ড আলোড়নের মধ্যে কোন মানুষ সুখী হতে পারে না। আত্ম-সংরক্ষণের জন্য সহজাত প্রবৃত্তির এই অভিব্যক্তিসমূহকে দমন ও উপেক্ষা করা বড়ই কঠিন। তবে এটা উত্তরণের একটি নিশ্চিত উপায় আছে। এটা হচ্ছে ঃ অন্যের সেবায় নিজের সব কিছু ভুলে যাওয়া। এটা হচ্ছে ঃ নিজের অন্তরের প্রেম-প্রীতি বাইরে প্রসারিত করা। অপরকে সাহায্য-সহায়তা করার কাজে সম্পূর্ণ নিবেদিত হয়ে যান এবং তখন আপনি আপনার মানসিক বিষাদ-বিকার,

আত্মসর্বস্বতা, লোভ-লালসা, অহংকার-অহমিকা ও আত্ম-ধার্মিকতা অবশ্যই ভুলে যাবেন।

প্রতিটি মানুষই তার জীবনকালের দায়িত্ব-কর্তব্যাদি সম্পাদনের পর শান্তিপূর্ণভাবে মৃত্যুবরণের জন্য অভিলাষী। কিন্তু ক'জন লোক এ ধরনের ঘটনার জন্য পটভূমি প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছে? ক'জন লোকেই তাদের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, দেশ, ধর্ম ও জাতির প্রতি স্বকীয় দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের কষ্ট স্বীকার করছে? এসব দায়িত্ব কর্তব্য সম্পন্ন না করে কোন মানুষ যদি মারা যায় তাহলে তার পক্ষে শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ মৃত্যুবরণ করা খুবই কঠিন কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে বৈ কি!

অনেক লোক মৃতদেহ দেখে ভয় পায়। কিন্তু মৃতদেহ অপেক্ষা জীবিত দেহই অধিকতর বিপজ্জনক ও ভয়ংকর। নিষ্প্রাণ মৃতদেহের চেয়ে জীবিত দেহ থেকেই মানুষ বেশী পরাভূত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে।

আপনি যদি আপনার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পাদন না করে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেন, তাহলে আপনার জন্ম আপনার নিজের কিংবা এ পৃথিবীর কারো উপকারে লাগল না। সুতরাং, আপনার দায়িত্ব কর্তব্য সম্পাদন করুন এবং সাহসের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হোন এবং একদিন এমন এক মৃত্যুহীন অবস্থা অর্জনে সক্ষম হবেন যেখানে আপনি পাবেন চিরন্তন সুখ আর শান্তি।

ধর্ম বই পড়ুন, অন্যকেও পড়তে উৎসাহিত করুন।
প্রতি বিহারে পাঠাগার গড়ে তুলুন।

—পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ।

অধ্যাপক শীলাচার শাস্ত্রী মহোদয় ছিলেন তাঁর সহপাঠী ও বন্ধু। এদেশে তাঁর সাবেক পরম বন্ধু ছিলেন সদ্ধর্মভাণক মহাসংঘনায়ক শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথের। এই পুস্তকের শ্রদ্ধেয় লেখক বিভিন্ন বিশ্ববৌদ্ধ সম্মেলনে যথা এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সম্মেলন (ABCP) বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সম্মেলন (WFB) ও বিশ্ব বৌদ্ধ সংঘ কাউন্সিলে শ্রদ্ধেয় মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরর নিকট এদেশের বৌদ্ধদের খবরাখবর নিতেন-খবর নিতেন পালি বুক সোসাইটির কারণ আমাদের প্রথম পুস্তক প্রকাশনা তাঁরই পুস্তকের বাংলা সংস্করণ।

শ্রদ্ধেয় লেখকের জ্ঞানের গভীরতা অসীম। এই মহাপুরুষ মালয়েশিয়ায় ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করেন এ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে এবং ১৯৬২তে মাত্র ২৭ জন নিয়ে কুয়ালালামপুরে বুড্ডিষ্ট মিশনারী সোসাইটি শুরু করেন। উক্ত সোসাইটির রজত জয়ন্তীর সময় মালয়েশিয়া ও দেশ বিদেশের থেরবাদী ও মহাযানী আজীবন সদস্য হয় ৭ হাজারেরও বেশী (ভয়েস অব বুড্ডিজম সাময়িকী রিপোর্ট) তন্মধ্যে আমিও একজন। শ্রদ্ধেয় লেখক সিংহলী, পালি, সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরেজী, চীনা ও মালয়েশীয় ভাষাবিদ্। তাঁর প্রকাশিত পুস্তকাবলীর সংখ্যা ৭৪ এবং বিভিন্ন ভাষায় রচিত বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রবন্ধাদি সহস্রাধিক। পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ তাঁর রচিত Why Buddhism. Religion in a Multi-Religious Society, You are Responsible এবং বর্তমান পুস্তক How to Overcome Your Difficulties–এর বাংলা সংস্করণ প্রকাশ ও প্রচার করেছে বাংলা ভাষীদের কাছে। বুদ্ধগয়াস্থ আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক পদে ভূষিত করে শ্রদ্ধেয় ডঃ কে শ্রী ধম্মানন্দর গুণকে স্বীকৃতি দেয়া হয় ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে।

আমরা শ্রদ্ধেয় মহানায়ক থেরোর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

বিজয় কৃষ্ণ বড়ুয়া
সাধারণ সম্পাদক
পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ।

অনুবাদক পরিচিতি

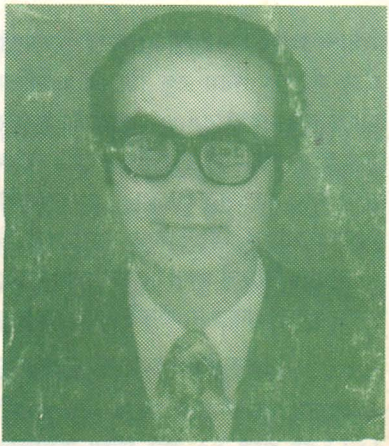

এই পুস্তিকার অনুবাদক শ্রী বিমলেন্দু বড়ুয়া একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হিসেবে সমাজে সুপরিচিতি। পঞ্চাশের দশক থেকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর বহু কবিতা, গল্প ও অন্যান্য লেখা প্রকাশিত হয়ে আসছে। দেশের বাইরে কলকাতার বিভিন্ন সাময়িকী ও সংকলনে বাংলায় এবং থাইল্যান্ডের ওয়ার্ল্ড ফেলোশীপ অব বুডিস্টস (ডব্লু এফ বি) ও মঙ্গোলিয়ার এশিয়ান বুডিস্ট কনফারেন্স ফর পীস (এবিসিপি) এর জার্নাল সমূহে ইংরেজীতে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। তিনি এখন বহুল প্রচারিত জনপ্রিয় দৈনিক আজাদী-র প্রধান সহ সম্পাদক এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভাপতি। ১৯৯৩ সালে চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন ১৯৯৭ সালে রোটারী ক্লাব অব চিটাগাং মিডটাউন ও ১৯৯৮ সালে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব থেকে কৃতী শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক হিসেবে পুরস্কৃত ও সম্বর্ধিত। থাইল্যান্ড, লাওস, মঙ্গোলিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত, কোরিয়া, বার্মা প্রভৃতি দেশ সফর। প্রকাশিত ও প্রণীত গ্রন্থ ঃ স্বপ্নময়ী শ্যামদেশে, সংঘরাজ শীলালঙ্কারের মহৎ জীবনালেখ্য, বিশ্ববরেণ্য বিশুদ্ধানন্দ (ইংরেজী ও বাংলায়), জ্যোতির্ময় জ্যোতিঃপাল, মেকং নদীর তীরে, রুশ-মঙ্গোলদের দেশে, কোরিয়ায় কিছুদিন, রেঙ্গুন রঙ্গিলা, পাষাণের মৌনতটে ইত্যাদি। জন্ম ঃ ১৫ এপ্রিল, ১৯৩৩ খৃঃ, বোয়ালখালী থানার কধুরখীল। পিতা প্রয়াত প্রিয়নাথ বড়ুয়া, মা শ্রীমতী বিধুমুখী বড়ুয়া।